Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 153 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 153 - 163
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

আধুনিকতা, উত্তর-আধুনিকতা এবং বিনয় মজুমদারের কবিতায় গাণিতিক তত্ত্ববিশ্ব

নরেশচন্দ্র মজুমদার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
সি এম জে ইউনিভার্সিটি, মেঘালয়
Email ID : nareshchandramajumder76@gmail.com
ও
গোপালচন্দ্র পাল
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ইউনিয়ন খ্রিস্টান ট্রেনিং কলেজ
Email ID : gchpal1971@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Poet Binay Majumdar, modernism, post-modernism, absurd-order of thinking, ambiguity of expression, one-line Poem, mathematical theories.

Abstract
Poet Binay Majumdar (1934 - 2006) is a wonder-person in the modern Bengali poetry genre. Binay Majumdar, who was really the star of Bengali poetry in the 60s, was not much discussed at the time; but controversy in life and creation never spared him. He left his high-ranking Govt.-job to pursue poetry. His relatives and aquaintances almost all considered him crazy, scorned or avoided him. He living alone for a whole life, living poetry alone — this is a great terrible achievement! He is almost a unique figure in history of modern Bengali poetry. His effortless move from modernism to post-modernism, in the constant review of poetry, broke style of poem by one line poetry, sometimes he gave it to a longer poem; Ambiguity of expression in sometimes strange arrangement of thoughts has pushed his creation into unknown circles. His creations are interspersed with the practical applications of mathematical theories.

Discussion

বাংলা কাব্যসাহিত্যের আধুনিকতার ধারাপাতে কবি বিনয় মজুমদার এক বিরল-ব্যতিক্রমী-ব্যক্তিত্ব। পঞ্চাশের দশকের আত্মপ্রকাশ এবং ষাটের দশকে পূর্ণপ্রতিষ্ঠা ঘটলেও বাংলা কবিতার নক্ষত্র-প্রতিম কবি বিনয় মজুমদার সমকালে খুব বেশি আলোচিত বা চর্চিত হননি। কিন্তু জীবন ও সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিতর্ক কখনও তাঁকে রেহায় দেয়নি। প্রতিভাবান ইঞ্জিনিয়ার হয়েও চাকুরিজীবীর চাকচিক্যময় জীবনের নিশ্চিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাঁকে আকৃষ্ট করেনি। কবিতার জন্যই সরকারি চাকরি ছেড়েছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 153 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আত্মজন এবং পরিচিত জনেরা প্রায় সকলেই তাঁকে পাগল প্রতিপন্ন করে ঠারে-ঠোরে অবজ্ঞা করেছেন কিংবা এড়িয়ে চলেছেন। আস্ত একটা জীবন একলা যাপন, একান্তই কবিতা যাপন—এ অতি ভয়াবহ কৃচ্ছ-সাধন! আধুনিক বাংলা কবিতায় তিনি প্রায় একক অন্য ব্যক্তিত্ব। আধুনিকতা থেকে উত্তর-আধুনিকতায় তাঁর অবিচল পদক্ষেপ!

আধুনিকতা : 'আধুনিকতা' শব্দটি শিল্প-সাহিত্য ক্ষেত্রে একটি অমীমাংসিত বিতর্কের বার্তাবহ। ইংরাজি 'মডার্নিটি' বা বাংলা আধুনিকতার ধারণাটি যেমন সরল নয়, তেমনি আধুনিকতার সূত্রগুলিও খুব সহজ শর্ত-সাপেক্ষ নয়; আবার খুব সুনির্দিষ্ট নয় আধুনিকতার সূচনা-লগ্নের নির্দেশনাও।

বাংলাকাব্যে আধুনিকতার তত্ত্ব-সন্ধানী গবেষক অধ্যাপক দীপ্তি ত্রিপাঠী আধুনিক বাংলাকাব্যকে 'মিশ্র সংস্কৃতির উপাসক'[১] রূপে অভিহিত করছেন। আধুনিকতার সংজ্ঞা নির্ধারণে কিছুটা নেতির আশ্রয় গ্রহণ করলেও আধুনিক বাংলা কবিতার ভাব ও আঙ্গিকের বিচারে দ্বাদশ লক্ষণ নির্ধারণ করেছেন তিনি। আধুনিক বাংলা কবিতার পঞ্চ পাণ্ডবের অন্যতম বুদ্ধদেব বসু কাব্যে আধুনিকতার প্রসঙ্গে বলেছেন, -

> "...এই আধুনিক কবিতা এমন কোনো পদার্থ নয় যাকে কোনো একটা চিহ্ন দ্বারা অবিকলভাবে সনাক্ত করা যায়। একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি। আশা আর নৈরাশ্য, অন্তর্মুখিনতা বা বহির্মুখিতা, সামাজিক জীবনের সংগ্রাম আর আত্মিক জীবনের তৃষ্ণা, এই সবগুলো ধারাই খুঁজে পাওয়া যাবে শুধু ভিন্ন-ভিন্ন কবিতে নয়, কখনো হয়তো বিভিন্ন সময়ে একই কবির রচনায়।"[২]

রবীন্দ্র-ভক্ত দার্শনিক আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং বিশিষ্ট কম্যুনিস্ট চিন্তাবিদ্ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁদের সম্পাদিত আধুনিক বাংলা কবিতার সংকলনে একাধিক রবীন্দ্র-কবিতাকে স্থান দিয়েও ভূমিকায় আধুনিক বাংলা কবিতার ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছেন, কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত, অন্তত, মুক্তি প্রয়াসী কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি। এইসব স্ববিরোধ-বিতণ্ডায় স্পষ্টত বোঝা যায় বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির কোনো শাখায়ই রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত ঋদ্ধ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেনি, কবিতার আধুনিকতাতেও রবীন্দ্রনাথই বাংলা কাব্যের প্রথম আধুনিক কবি। তাই আধুনিক বাংলা কাব্যের অন্যতম প্রধান কর্ণধার কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বিশ্বাসে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের 'পিতৃ-পদপাচ্য'; তিনি 'দিনান্ত' প্রবন্ধে দ্বিধাহীনভাবে বলছেন, -

> "রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলা সাহিত্যের পিতৃ-পদবাচ্য নন, আধুনিক মনোবিজ্ঞানে যে-প্রক্রিয়ার নাম আরোপ, তারই সার্বভৌম অভিব্যাপ্তিতে তিনি প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর মানস প্রতিমূর্তি;"[৩]

স্বাভাবিকভাবে বাংলা কবিতায় আধুনিকতার সূত্রপাতও রবীন্দ্র-কলমেই; বুদ্ধদেব বসুও মনে করতেন, রবীন্দ্রনাথের পরে রবীন্দ্রনাথই প্রথম আধুনিক কবি। আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় - "পাঁজি মিলিয়ে মডারনের সীমানা নির্ণয় করবে কে? ...এই আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।"[৪] কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর *কবিতার কথা*-য় বলছেন, -

> "বাংলা কাব্যে বা কোনো দেশেরই বিশিষ্ট কাব্যে আধুনিকতা শুধু আজকের কবিতায় আছে অন্যত্র নয় একথা ঠিক নয়।"[৫]

প্রসঙ্গত তিনি আরও লিখছেন, -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 153 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "মানুষের মনের চিরপদার্থ কবিতায় বা সাহিত্যে এবং মহৎ লেখকের হাতে যে বিশিষ্টতায় প্রকাশিত হয়ে ওঠে তাকেই আধুনিক সাহিত্য বা আধুনিক কবিতা বলা যেতে পারে।"[৬]

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁদের সম্পাদিত *আধুনিক বাংলা কবিতা* সংকলনের ভূমিকায় বলেছেন, -

> "কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত; অন্তত, মুক্তি প্রয়াসী কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি।"[৭]

কিন্তু উক্ত সংকলনে রবীন্দ্রনাথের একাধিক কবিতা স্থান পাচ্ছে। স্বভাবত প্রশ্ন জাগে 'কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী' এবং 'ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত; অন্তত, মুক্তি প্রয়াসীর' স্বকৃত-তত্ত্ব-সীমা প্রাজ্ঞ ও মনস্বী প্রাবন্ধিক আবু সয়ীদ আইয়ুব নিজেই তাঁদের সংকলনে রক্ষা করতে পারলেন না বা সচেতনভাবেই রক্ষা করলেন না। সংকলনের সূচনা করেছেন রবীন্দ্র-কবিতা দিয়ে, তাও সে রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কবিতা দিয়েই। পরবর্তীতে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ*-এ স্পষ্টতই স্বীকার করে নিলেন, 'আধুনিকতার সংজ্ঞা দেওয়া দুঃসাধ্য'। অন্তত রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে আধুনিকতার অর্থ সন্ধান একেবারেই অর্থহীন। তাই তিনি আরও বললেন, -

> "আধুনিকতার ধারণা স্বভাবতই গতিশীল, ধাবমান। সেকালের যৌবন মদমত্ত আধুনিকতা একালে লোলচর্ম, পলিতকেশ; আবার একালের ঝকঝকে আধুনিকতা পঁচিশ, পঞ্চাশ কি একশ বছর পরে বেজায় সেকেলে হয়ে যাবে।"[৮]

সুতরাং বলা যেতেই পারে, আধুনিকতা স্থান-কাল-পাত্র রূপেণ-সংস্থিত কোনো বিষয় নয়। একই স্থানের একই কালের সকল স্রষ্টা আধুনিক হবেন এমন নিশ্চিয়তা যেমন থাকে না, তেমনি একই স্রষ্টার সকল সৃষ্টি আধুনিকতার মাত্রা অতিক্রম করবে এমনও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। এইদিক থেকে আধুনিকতা নিশ্চিতভাবেই একটি আপেক্ষিক ধারণা, কিন্তু তা সর্বাংশে সময়-নিরপেক্ষও নয়। ভারতচন্দ্র তাঁর সময়ে অন্যান্য মঙ্গল কবিদের নিরিখে আধুনিক স্রষ্টা, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর স্রষ্টা ও সৃষ্টির মানদণ্ডে তিনি অনাধুনিক। একইভাবে বিংশ শতাব্দীর তুলনায় ঊনবিংশ শতাব্দীর স্রষ্টা ও সৃষ্টি আধুনিক মনে হয় না। ওয়ার্ডসওয়ার্থ-কোলরিজ-এর দেশকালে ইংরাজি কাব্য-কবিতা যে অর্থে আধুনিক সৃষ্টি, সেই একই কালের বাংলা কাব্য-সাহিত্য আধুনিকতার দাবি রাখে না। বাংলা কাব্য-সাহিত্যের আধুনিকতার জন্য এক মহাযুদ্ধের অপেক্ষার অনিবার্যতা দেখতে হয়।

আধুনিক কাব্য-গবেষক অধ্যাপক দীপ্তি ত্রিপাঠী তাঁর *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়* গ্রন্থে, 'আধুনিক' শব্দটি আপেক্ষিক ধরে নিয়েও সীমায়িত ধারণায় ভাবের দিক থেকে এবং আঙ্গিকের দিক থেকে বারোটি ক'রে লক্ষণ-সূত্র নির্দেশ করেছেন, অধ্যাপিকা ত্রিপাঠীর মতে, ভাবের দিক থেকে লক্ষণ-চিহ্নিত আধুনিকতা হল,[৯] - ১. নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাত। ২. বর্তমান জীবনের ক্লান্তি ও নৈরাশ্যবাদ। ৩. আত্মবিরোধ ও অনিকেত (rootless) মনোভাব। ৪. বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য হ'তে সচেতন গ্রহণ। ৫. ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের প্রভাব। অচেতন মনের ক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে চিন্তাধারার অসম্বন্ধতা। ৬. ফ্রেজার প্রমুখ নৃতাত্ত্বিক, ও প্ল্যাঙ্ক, বোর, আইনস্টাইন প্রভৃতি আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানীর প্রভাব। ৭. মার্ক্সীয় দর্শনের, বিশেষত সাম্যবাদী চিন্তাধারার, প্রভাবে নতুন সমাজ সৃষ্টির আশা। ৮. মননধর্মিতা— অনেক সময় জ্ঞানের বিপুল ভারে দুরূহতার সৃষ্টি। ৯. বিবিধ প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধে (যেমন - প্রেম, সুন্দর, কল্যাণ, ধর্ম) সংশয় এবং তৎসঞ্জাত অনিশ্চয়তার উদ্বেগ। ১০. দেহজ কামনা, বাসনা ও তৎপ্রসূত অনুভূতিকে স্বীকার করা এবং প্রেমের শরীরী রূপকে প্রত্যক্ষ করা। ১১. ভগবান এবং প্রথাগত নীতিধর্মে অবিশ্বাস। ১২. রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ এবং নতুন সৃষ্টির পথসন্ধান।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 153 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

একই ভাবে আঙ্গিকের দিক থেকে লক্ষণ-চিহ্নিত আধুনিকতা হল,[১০] - ১. বাকরীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণ। গদ্যের ভাষা, প্রবাদ, চলতি শব্দ, গ্রাম্য শব্দ ও বিদেশী শব্দের ব্যবহারে গদ্য, পদ্য ও কথ্য ভাষার ব্যবধান বিলোপের চেষ্টা। পরবর্তী পর্যায়ে অতি-ব্যবহৃত পদ্যগন্ধী শব্দকেও গ্রহণ অর্থাৎ ভাষা সম্বন্ধে সর্বপ্রকার শুচিবায়ু পরিহার। ২. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুরাণ এবং বিখ্যাত কাব্য অথবা ভাবনা থেকে উদ্ধৃতির যত্রতত্র প্রয়োগে সিদ্ধরসকে চূর্ণ করা বা অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন অনুভূতির সমন্বয় সাধন। ৩. প্রচলিত কবিপ্রসিদ্ধ উপমা ও বর্ণনার বিরলতম ব্যবহার। প্রচলিত কাব্যিক শব্দ, যথা—ছিনু। গেনু, মনে, হিয়া, প্রভৃতি বর্জন। ৪. প্রাচীন উপমা বা শব্দের অভিনব অর্থে প্রয়োগ এবং তৎসহযোগে নতুন চিত্রকল্প সৃষ্টি। ৫. শব্দ প্রয়োগে বা গঠনে মিতব্যয়িতা ও অর্থঘনত্ব সৃষ্টির চেষ্টা। ৬. এই মিতব্যয়িতার উদ্দেশ্যে বাহুল্য বর্জনের ফলে মধ্যবর্তী চরণের অনুল্লেখ। তার জন্য চিন্তাধারার মধ্যে একটা উল্লম্ফনের সৃষ্টি, আপাত-দৃষ্টিতে যাকে মনে হয় অসম্বন্ধ। ছড়ার উল্লম্ফনের সঙ্গে তার পার্থক্য মৌলিক। ৭. নামবাচক বিশেষ্য, বহুওপদময় বিশেষণ, অব্যয় এবং ক্রিয়ার পূর্ণরূপের ব্যবহার। চলতি ক্রিয়াপদের সঙ্গে সংস্কৃতবহুল বিশেষ্য বা বিশেষণের সংযোগ। ৮. প্রচলিত পয়ার, সনেট ও মাত্রাপ্রধান ছন্দের রূপান্তর এবং মধ্যমিলের (internal rhyme) সৃষ্টি। ৯. গদ্যছন্দের ব্যবহার। ১০. ব্যঙ্গ, বিতর্ক, অদ্ভুত, বীভৎস রসের বহুল ব্যবহার। ১১. শব্দালংকার অপেক্ষা বিরোধাভাস, বক্রোক্তি, স্মরণ প্রভৃতি অর্থালংকারের ব্যবহার। ১২. বিষয়-বৈচিত্র্য।

উপরিউক্ত লক্ষণ-সূত্রাদি থেকে এটুকু স্পষ্টত উপলব্ধ হয়, রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বিরোধিতা ছাড়া বাকি সব লক্ষণ-সূত্রই রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে কম-বেশি লক্ষ করা যায়। তথাকথিত আধুনিক কিংবা আধুনিকতার বিদ্রোহটা ছিল মূলত অন্ধ-রবীন্দ্রানুসরণের বিরুদ্ধে। তাই বিষ্ণুদে'র মতো প্রতিনিধিস্থানীয় আধুনিক কবির কাছে ২৫শে বৈশাখের অকপট ভাষ্য ছিল,

“রবীন্দ্রব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে
চিরস্থায়ী জটাজালে জাহ্নবীকে বাঁধি না, বরং
আমরা প্রাণের গঙ্গা খোলা রাখি, ...”[১১]

শুধুমাত্র সময়-চিহ্নে নয়, ভাব-স্বভাব কবিতার আঙ্গিক ও ভাষা-শৈলীতেও বিনয় মজুমদার পুরোদস্তুর আধুনিক। কিন্তু আধুনিকতার সীমাতেও তিনি সীমায়িত নন।

“দোতলার রূপকথা থেকে উঠে তেতলায় যাওয়া যায় অনুরূপ সিঁড়ি ভেঙে
সিঁড়ি ভেঙে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ...”[১২]

উত্তর-আধুনিকতা : উত্তর-আধুনিকতা বহতা সময়ধারার আরও এক উদ্বেজিত কালপর্ব। সময় কখনও থামে না। বৌদ্ধিক মাত্রায় আধুনিকতাও সময়ের সমান্তরালে চিরবহমানতার ধারাপাত। তাই কোনো খণ্ডিত কালপর্বের সৃষ্টিকে আধুনিক বলে দাগিয়ে দেওয়াটা যেমন সঙ্গত মনে হয় না, তেমনি উত্তর-আধুনিকতাও কোনো কালচিহ্নে খণ্ড-চিহ্নিত ধারণা হতে পারে না। কালের পেষণে পিষ্ট বা পরিপুষ্ট উপাদান সাহিত্য পদবাচ্য হতে পারে না। সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল চিরত্ব। কালোত্তীর্ণ না-হলে সাহিত্যের সহিতত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। যদিও সব দেশ সব ভাষার শিল্প-সংস্কৃতিতেই আধুনিকতার ধারণাটি বিখণ্ডিত কালের গণ্ডিতেই সীমায়িত করা হয়ে থাকে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে আধুনিকযুগ নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে অষ্টাদশ-উত্তর শতাব্দী, অর্থাৎ ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দী এবং উত্তরকালকে। কিন্তু আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে নিহিত কবিতা কিংবা কথাসাহিত্যেও যখন আধুনিকতার লক্ষণ-সূত্র সন্ধান করা হয়, তখন সময়ের সমগ্রতাকে বিখণ্ডিত বহুখণ্ডিত ক'রেই ভিন্ন মাত্রায় আধুনিকতাকে ধরার চেষ্টা দেখা যায়। তাই তথাকথিত এক আধুনিক সময় প্রবাহের মধ্যেই অন্য আধুনিকতার সন্ধানে অধুনান্তিক বা উত্তর-আধুনিকতায় পৌঁছে যাওয়া। যদিও অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য বলছেন, -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 153 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "প্রতীচ্যের আধুনিকোত্তর জীবন বীক্ষণ যখন সংস্কৃতির নানা দিগন্তে, বিভিন্ন প্রকাশ মাধ্যমে, গৃহীত পরীক্ষিত-বিতর্কিত হচ্ছে প্রবল পরাক্রমে সে-সময় বাংলা সাহিত্যেও উত্তর আধুনিকতার তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রচুর বিতণ্ডা চলছে।"[১৩]

আবার পোস্টমর্ডান কবিতা বিচার গ্রন্থে সমীর রায়চৌধুরী লিখেছেন, -

> "অধুনান্তিকতা বা পোস্টমর্ডানিজম লক্ষণাত্মক। লক্ষণগুলি আলাদা। অধুনান্তিক কবিতা ওপেন এন্ডেড, ক্রমশ বেরিয়ে এসেছে বদ্ধ আঙ্গিক থেকে। যেকোনও বিন্দু থেকে শুরু হয়ে যেকোনও জায়গায় শেষ হতে পারে। এলোমেলোর মধ্যে যে খেলা থাকে তাকেই বৈশিষ্ট্য হিসাবে ঠাঁই দেয়। অথচ খাপছাড়া বলা যাবে না। প্রতি পরতে আবিষ্কার করতে চায় অর্থবোধকতার নতুন এলাকা। প্রবাল দাশগুপ্ত যাকে বলেছেন নবাঞ্চল। সচেতন অনায়াস যেখানে গন্তব্য।"[১৪]

সমীর রায়চৌধুরী মশাই আরও লিখছেন, -

> "কবিতার ভাষা এখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অসম্বন্ধ, অসংলগ্ন, বাক্যগুলো বিয়োজক, শব্দগুলো আকস্মিক, অভূতপূর্ব সম্পর্কসূত্রে নিয়োজিত, প্রতিটি চরণে বা পদক্ষেপে আলাদা থিম। দ্রুত পাঁয়তারা বদল। আধুনিক কবিতায় এ ধরনের বৈচিত্র্য বা প্লুরালিজম ছিল প্রায় অসম্ভব।"[১৫]

আধুনিকতা থেকে উত্তর আধুনিকতার এই উত্তরণের ইশারা পাঁচ বা ছয়ের দশকের কিছু কিছু সৃষ্টিতেও প্রকাশ পেয়েছে। পাঁচের দশকের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি শঙ্খ ঘোষের 'দিনগুলি রাতগুলি' উক্ত লক্ষণাবলির ইঙ্গিতবহ। পরে রচিত উৎপলকুমার বসুর 'বাইশ লাইন' বা 'সাড়ে উনিশ লাইন' এই জাতীয় ইশারার সুনিশ্চিত ফসল। মেজাজে ভাষায় ছন্দে, এমন কি নামকরণেও দুরন্ত দুর্দান্ত প্রথা ভাঙার খেলা আছে এখানে। কবির কণ্ঠস্বরের কোনো প্রাধান্য নেই, নেই শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ; বরং আছে নির্মুখোশ যৌথ যাপনের অনায়াস প্রয়াস।

এই লক্ষণ ক্ষুধার্ত প্রজন্মের থেকে আট ও নয়ের দশকের বাংলা কবিতার সব অঞ্চলকেই কম-বেশি দখলে নিয়ে নেয়। কবি বিনয় মজুমদারের *ফিরে এসো চাকা* বা পরবর্তীতে রচিত সব কাব্যেই কবিতার নবাঞ্চল সন্ধানের এই প্রয়াস, প্রথা ভাঙার এই খেলা প্রবলভাবে সক্রিয় থেকেছে। যে-কোনও বিন্দু থেকে শুরু হয়ে যে-কোনও জায়গায় শেষ হওয়ার লক্ষণে বিনয় মজুমদার পুরোদস্তুর আধুনিকোত্তর। এলোমেলোর মধ্যে খেলাতেও তাঁর কাব্যিক বিশেষত্ব স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত।

"আমি একা একা হাসি একা একা কথা বলি
আমার এ ঘরে আমারই তো কথাকলি।"[১৬]

বিনয় মজুমদারের কাব্যচর্চা : আমরা জানি, বাংলাকাব্যের ধারাপাতে প্রথম-পর্বের আধুনিকতার সূত্রপাত মধুসূদন-বিহারীলালের কলমে। বাংলা কাব্যের ভাব-ভাষা ও ছন্দমুক্তির প্রথম ধাপটি নির্মাণ করেছিলেন মধুসূদন এবং বিহারীলাল। প্রকৃত আধুনিক বাংলা কবিতার নিঃসংশয়িত সূচনা রবীন্দ্র-কলমে। গীতিকবিতার বহুল-বিচ্ছুরিত ভাবরাশি, আধুনিক ভাষা ও ছন্দের নিত্যনব নিরীক্ষায় এবং বহু-বিচিত্র আঙ্গিকের নির্মাণে আর সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ নির্বিকল্প স্রষ্টা। বাংলা কবিতায় রবীন্দ্র-উত্তর আধুনিকতায় 'কল্লোল' সেতুর এপারে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম, মধ্যখানে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত প্রমুখ আরও পরে জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ-বুদ্ধদেব-বিষ্ণু-অমিয় রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতার পঞ্চপাণ্ডব রূপে অভিহিত। বিশ শতকের চার ও পাঁচের দশক ভরিয়ে রেখেছেন, ভুলিয়ে রেখেছেন মূলত এঁরাই। এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বর্ণময় পাঁচ, ছয় ও সাতের দশকেও উঠে এসেছেন শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, উৎপলকুমার বসু, তারাপদ রায়, পূর্ণেন্দু পত্রীসহ বিশিষ্ট আরও সব কবির

দল। এবং তাঁদের কারো কারো হাত ধরে সূচিত হয়েছে বেশ কিছু কবিতা আন্দোলন; আর তারই সূত্রে বাংলা কবিতাতেও এসে গেছে উত্তর-আধুনিকতার প্রভাব। প্রভাত চৌধুরী, মলয় রায়, যশোধরা রায়চৌধুরী, ফাল্গুনী রায়, চন্দন ভট্টাচার্য, সমীরণ ঘোষ, শম্ভু রক্ষিত, সুমিতেশ সরকার, অংশুমান কর, উত্তর বসু, অমিতাভ মৈত্র, জহর সেনমজুমদার, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, নাসের হোসেন, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অসংখ্য কবি উত্তর-আধুনিকতার শর্তকে বহন করেছেন শর্তহীনভাবে।

আজ বাংলা কবিতা আর ইংরাজি তথা ইউরোপীয় কবিতা একই সরণির সহযাত্রী। সময় কখনও থামে না, স্বভাবত বাংলা কবিতার সময়ও কখনো থামেনি। গুপ্ত-কবির ব্যঙ্গ-রসাত্মক জাত্যাবেগ পেরিয়ে রঙ্গলাল-মধুকবির জাতীয়তার আবেগ থেকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ছায়া-প্রচ্ছায়া; বিহারীলালের মর্মবেদনার ভাব-ভাষা থেকে স্বয়ম্ভু ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্লেটোনিক প্রেম ও আস্তিক্য চেতনার সুগভীর অন্তহীনতা এবং সেই অন্তহীন অভিযাত্রায় সঙ্গ দিতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রমুখ একদল রবীন্দ্রানুসারীর দিশাহীন ঘূর্ণি-বিভ্রম; 'কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি' সেতু বেয়ে তথাকথিত রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতা এবং অধুনান্তিকতা আরও আরও দূর যাত্রা -

> "একটি শহরের পথ ধ'রে চলেছি। কলকাতা কিম্বা
> অন্য কোনো পরিচিত শহর নয়। স্বপ্নেরই স্বকল্পিত
> শহর। রাত্রির হয়েছে। দুপাশের বাড়িগুলো খুব
> উঁচু নয়। এই রাস্তাই সেই রাস্তা যেখানে সে থাকে।"[১৭]

গায়ত্রী থেকে ঈশ্বরী ভাবনার চক্রাবর্তনে গণিতের শূন্যাবদান :

কবিতা কবির কল্পনা-লতা; কিন্তু কবিতা কেবল শব্দার্থের খেলা কিংবা ছন্দালঙ্কারের সৌখিন মজদুরি মাত্র নয়, নয় শ্রেষ্ঠ শব্দের শ্রেষ্ঠতম বিন্যাসও; প্রকৃত কবিতা কবির স্বগতোচ্চারণ — বলা ভালো, স্বগত সত্যোচ্চারণ। প্রকৃত কবির জীবন ও কবিতায় প্রকৃতার্থে কোনো ভিন্নতা থাকে না; জীবনই কবিতা হয়ে ওঠে এবং কবিতাই জীবন হয়ে যায়। বিনয় মজুমদার সেই কবি, যার জীবন ও কাব্যকে আলাদা করা বস্তুত অসম্ভব। প্রতিভাবান ইঞ্জিনিয়ার হয়েও চাকুরিজীবীর চাকচিক্যময় জীবনের নিশ্চিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাঁকে আকৃষ্ট করেনি। কবিতার জন্যই উচ্চপদস্থ সরকারি চাকরি ছেড়েছেন। এ-দৃষ্টান্ত বিশ্ব-কাব্য সংসারেই বিরলতম। মুদ্রিত সংস্করণে বিনয় মজুমদার বিরচিত কাব্য-সম্ভারের প্রথম প্রকাশকালসহ একটি তালিকা এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে — *নক্ষত্রের আলোয়* (আশ্বিন, ১৩৬৫/ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮); *গায়ত্রীকে* (ফাল্গুন, ১৩৬৭/ মার্চ, ১৯৬১); *ফিরে এসো চাকা* (ভাদ্র, ১৩৬৯/ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২); *আমার ঈশ্বরীকে* (জৈষ্ঠ্য, ১৩৭১/ জুন, ১৯৬৪); *ঈশ্বরীর* (ভাদ্র, ১৩৭১/ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪) *ঈশ্বরীর কবিতাবলী* (ভাদ্র, ১৩৭১/ জুলাই, ১৯৬৫); *অধিকন্তু* (ভাদ্র, ১৩৭৪/ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭); *অঘ্রানের অনুভূতিমালা* (শ্রাবণ, ১৩৮১/ জুলাই, ১৯৭৪); *বাল্মীকির কবিতা* (শ্রাবণ, ১৩৮৩/ জুলাই, ১৯৭৬); *শ্রেষ্ঠ কবিতা* (১৯৮১); *আমাদের বাগানে* (ভাদ্র, ১৩৯১/ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪); *আমি এই সভায়* (পৌষ, ১৩৯১/ জানুয়ারি, ১৯৮৪); *এক পংক্তির কবিতা* (পৌষ, ১৩৮১/ জানুয়ারি, ১৯৮৮); *আমাকেও মনে রেখো* (পৌষ, ১৪০২/ ডিসেম্বর, ১৯৯৫); *আমিই গণিতের শূন্য* (পৌষ, ১৪০৩/ জানুয়ারি, ১৯৯৬); *এখন দ্বিতীয় শৈশবে* (পৌষ, ১৪০৬/ জানুয়ারি, ১৯৯৯) কবিতা বুঝিনি আমি (পৌষ, ১৪০৮/ জানুয়ারি, ২০০১)।

উক্ত কাব্যগ্রন্থগুলি পর্যালোচনায় দেখা যায়, কবি বিনয় মজুমদারের সৃষ্টিসত্তা মূলত দুটি পর্বে বিবর্তিত হয়ে পরিণতি-পরমতা খুঁজেছে। কবির প্রথম প্রকাশিত কাব্য *নক্ষত্রের আলোয়* (১৯৫৮) আলোক-সন্ধানী কবি সবিনয়ে পূর্বজ প্রজ্ঞাবান কবি জীবনানন্দ দাশের অনুসারী হয়ে অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমপ্রজ্ঞায় অবগাহন করছেন। নিজের সৃষ্টিসত্তার পরিমাপ করছেন। নিজেকে ইচ্ছে মতন ভাঙছেন। ইচ্ছে মতন গড়তে চাইছেন।

প্রথমত, ঈশ্বরী-পর্ব : *ফিরে এসো চাকা* (১৯৬২) থেকে *ঈশ্বরীর কবিতাবলী* (১৯৬৫) হয়ে *অঘ্রানের অনুভূতিমালা* (১৯৭৪)-য় ১৯৫৮ থেকে ১৯৭৪ - প্রায় দুই দশক জুড়ে এক বিনয় মজুমদারকে বিশিষ্ট কবি রূপে পাওয়া যায়। এই পর্বকে চিহ্নিত করা যায়, ঈশ্বরী-পর্ব নামে, এই পর্বের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিসমূহ - *নক্ষত্রের আলোয়* (১৯৫৮), *গায়ত্রীকে* (১৯৬১), *ফিরে এসো*

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 153 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চাকা (১৯৬২), *আমার ঈশ্বরীকে* (১৯৬৪), *ঈশ্বরীর* (১৯৬৪) *ঈশ্বরীর কবিতাবলী* (১৯৬৫), *অধিকন্তু* (১৯৬৭), *অঘ্রানের অনুভূতিমালা* (১৯৭৪) ইত্যাদি।

দ্বিতীয়, শূন্য-পর্ব : *আমাদের বাগানে* (১৯৮৪) থেকে *আমিই গণিতের শূন্য* (১৯৯৬) হয়ে *কবিতা বুঝিনি আমি* (২০০১) অবধি ১৯৮৪ থেকে ২০০১—প্রায় দুই দশক সময়কাল ব্যাপী আমরা পেয়ে যায় অন্য এক বিনয় মজুমদারকে; যে কবি শিশুর মতো সরল, শিশুর মতোই অভিমানী। এই পর্ব অভিহিত হতে পারে, শূন্য-পর্ব নামে। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিসমূহ—*আমাদের বাগানে* (ভাদ্র, ১৩৯১/ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪); *আমি এই সভায়* (পৌষ, ১৩৯১/ জানুয়ারি, ১৯৮৪); *এক পংক্তির কবিতা* (পৌষ, ১৩৮১/ জানুয়ারি, ১৯৮৮); *আমাকেও মনে রেখো* (পৌষ, ১৪০২/ ডিসেম্বর, ১৯৯৫); *আমিই গণিতের শূন্য* (পৌষ, ১৪০৩/ জানুয়ারি, ১৯৯৬); *এখন দ্বিতীয় শৈশবে* (পৌষ, ১৪০৬/ জানুয়ারি, ১৯৯৯) কবিতা বুঝিনি আমি (পৌষ, ১৪০৮/ জানুয়ারি, ২০০১) ইত্যাদি।

এই দুই পর্বের মধ্যরেখায় অবস্থান করছে একটি সন্ধি-পর্ব কিংবা উপপর্ব, যা কবির সৃষ্টিসত্তার দুর্বিনয় বিপর্যয়-পর্ব রূপে চিহ্নিত হতে পারে। *বাল্মীকির কবিতা* (১৯৭৬)-র ছাপান্নটি কবিতা তর্কে-প্রতর্কে কবির মগ্ন-চৈতন্যের দ্বন্দ্বময় বিপর্যয়ের স্বরূপকেই প্রকাশ করে।

সব মিলিয়ে ১৯৫৬ থেকে ২০০৬ - বিনয় মজুমদারের পাঁচ দশকের কাব্য-যাপন স্পষ্টত দুটি পর্বে বিভাজিত। *নক্ষত্রের আলোয়* উন্মেষিত ঈশ্বরী-পর্ব; যেখানে জীবনানন্দ পেরিয়ে আধুনিক বাংলা কবিতার অন্য দিগন্ত সন্ধানী বিনয় মজুমদার। *বাল্মীকির কবিতা* পেরিয়ে শূন্য-পর্ব; যেখানে কবি বিনয় মজুমদারের যেন জন্মান্তর—আধুনিকতা পেরিয়ে অধুনান্তিকতায় অবগাহন।

বিনয় মজুমদারের কবিত্ব-খ্যাতির প্রায় সবটুকু জুড়ে আছে *ফিরে এসো চাকা (১৯৬২)* কাব্যটি। *গায়ত্রীকে* গ্রন্থটি কবির *ফিরে এসো চাকা* কাব্যের ১ম সংস্করণের অন্য নাম রূপে অনেকেই মনে করেন। এবং তার সঙ্গত কারণও রয়েছে। এই কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই 'ফিরে এসো চাকা' কাব্যে গৃহীত হয়েছে। কিছু কবিতা নেওয়া হয়েছে সরাসরি বা অবিকৃতভাবে, আর কিছু নেওয়া হয়েছে পরিমার্জিত রূপে।

কবির ইচ্ছে-কর্মে *গায়ত্রীকে* প্রথম সংস্করণ; দ্বিতীয় সংস্করণে 'ফিরে এসো চাকা'; আর তৃতীয় সংস্করণে *আমার ঈশ্বরীকে*— এভাবেই বদলে বদলে যায় কাব্য নাম। কবিতা সংখ্যার তারতম্য ঘটে। সংযোজন বিয়োজন পরিমার্জন চলতেই থাকে। গায়ত্রীকে কাব্যের প্রথম কবিতাটিই *ফিরে এসো চাকা* কাব্যের প্রথম কবিতা। শুধুমাত্র ১৩ সংখ্যক পংক্তিতে সচেতন কিছু পরিমার্জন আছে; *গায়ত্রীকে*-তে 'ক্লান্ত ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাসে আলোড়িত করে।' *ফিরে এসো চাকা*তে হয়েছে, 'দীর্ঘ-দীর্ঘ ক্লান্তশ্বাসে আলোড়িত করে;' গায়ত্রী - ঈশ্বরী - মনোলীনা - বিস্মরণী একইরূপে নানাভাবে কবির মানসলোকে বিবর্তিত হতেই থাকেন এক নারী। অপরূপা নারী থেকে অরূপা ঈশ্বরীর ধ্যানে-অনুধ্যানেই কবির সৃষ্টিসত্তা মুখর হয়ে ওঠে; ঈশ্বরীর অনুভবনে কখনো তিনি নীরব, কখনো তিনি নিরাশ, আবার কখনো নিরঙ্কুশ দ্বন্দ্বে তাঁর অন্তঃক্ষরণ কিংবা আত্মদংশনে তাঁর কাব্য-যাপন।

"কবিতা কিংবা গাণিতিক তত্ত্ববিশ্বে অবগাহন
অন্তত গণিতশাস্ত্রে যেসব নিয়ম আছে, সূত্র আছে
তারা সব ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের নিয়ন্তা, শাসক;
তাদের কর্মের ক্ষেত্র বিশ্বময়, সর্বত্র বিস্তৃত;
তাদের ক্ষমতাবলী স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সীমাহীন, ..."[১৮]

উত্তর-আধুনিকতার ভাব-ভাষা-আঙ্গিকে বাংলা কবিতায় আঙ্কিক মাপন-কুশলতা দিয়ে গেলেন আপন খেয়ালে এবং অঙ্ক নিয়ে খেলতে খেলতেই পরিণতি পরমতায় যেন বলে গেলেন *কবিতা বুঝিনি আমি*। এ-ও যেন এক অনির্বাণ অভিমান! তিনি কবিতা বোঝেননি না কবিতার পাঠক তাঁকে বোঝেনি? ঈশ্বরীর ধ্যানে-অনুধ্যানে আর কবিতার এই বোঝা না-বোঝাতেই বিনয় মজুমদার আধুনিক বাংলা কবিতার মাইলস্টোন হয়ে রইলেন। এই অসামান্য অবদান সূত্রেই অঙ্ক-প্রিয় ইঞ্জিনিয়ার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 153 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কবি গাণিতিক তত্ত্ববিশ্বে সংযুক্ত করে গেলেন তাঁর সৃষ্টি-পাগল নির্মুখোশ কবি-মনটিকে। লিখে ফেললেন, *আমিই গণিতের শূন্য* [১৯৯৬]।

"আমিই গণিত-এর শূন্য। গণিতের বইতে শূন্য
ছাপা হয় এইভাবে ০ — এই ছাপা শূন্য আমি।
আমার সন্তানদল, এসেছ? খোঁজ ক'রে দেখুন
পাঠক পাঠিকাগণ ০ বিষয়ক যত তত্ত্ব পৃথিবীর
লোকে শুনেছে ও জেনেছে তার সব তত্ত্বই
একজন মাত্র লোক আমি বলেছি।"[১৯]

একটি ছয় পংক্তির কবিতা 'আমিই গণিতের শূন্য'। একই নামে, একই সঙ্গে একটি কাব্যগ্রন্থও। কাব্যটি প্রকাশিত হয় কলকাতা বইমেলা, ১৯৯৬-তে। উৎসর্গ করা হয়েছে গায়ত্রী চক্রবর্তীকেই। *আমিই গণিতের শূন্য* কাব্যে কবিতার সংখ্যা চল্লিশ।

সংখ্যা তত্ত্বে 'শূন্য' অনিবার্য এক আশ্চর্যবিনিশ্চয়। শূন্য দ্ব্যর্থবোধক শব্দ। আপাত অর্থে 'শূন্য' মূল্যহীন, অর্থহীন উপেক্ষা-চিহ্ন মাত্র। গাণিতিক বীক্ষণে 'শূন্য' আদি এবং অন্তহীনতার ইঙ্গিতবহ; প্রকৃতার্থে 'শূন্য'ই গণিতকে অশেষ করেছে। ভারতীয় গাণিতজ্ঞ সর্বশ্রদ্ধেয় রামানুজন দেখেছিলেন, সংখ্যার পরিমাপের একদিকে জিরো বা শূন্য, অন্য দিকে ইনফিনিটি। এই দুইয়ের সমন্বয়েই শূন্যতা ভাষা ও অর্থ খুঁজে পায়।

শূন্যের ধারণা নিছক অঙ্কের সীমায় সীমাবদ্ধ নয়; সাহিত্যে বিশেষত বাংলাসাহিত্য শূন্যের উত্তরাধিকার বহন করেছে চর্যাপদের কাল থেকেই। মধ্যযুগের কবি রামাই পণ্ডিত 'শূন্যপুরাণ' শীর্ষক মঙ্গলকাব্যি লিখেছিলেন 'ধর্মমঙ্গল'-এর আদলে, যেখানে স্বয়ং 'ধর্মঠাকুর'ই হলেন 'নিরঞ্জন' বা 'শূন্য'। কিন্তু মধ্যযুগ-উত্তরকালের কবিরা শূন্যের মধ্যে ধর্ম বা ধর্মের মধ্যে আর শূন্যের সন্ধান করলেন না। মধু-কবি কিংবা বিহারীলাল পর্বে শূন্যতা দ্যোতিত হয়েছে নিঃস্বতার, নিঃসঙ্গতার হাহাকারে। রবীন্দ্রনাথ শূন্যতাকে পূর্ণতার বিপরীতার্থে গ্রহণ করেননি। তাঁর দার্শনিক অনুভবে— 'তবু শূন্য শূন্য নয়, ব্যাখ্যাময়।'

নিরঞ্জন শুভ্রশূন্যতার পথেই অবগাহন করেছেন কবি বিনয় মজুমদার। 'আমিই গণিতের শূন্য' বলতে কবি নিঃসঙ্গতাবোধের সাথে পূর্ণতাবোধের এক প্রচ্ছায়ায় ডুবে থাকেন। যখন বলেন, -

"...বুড়ো হয়ে গেছি, নারী
দেখলে আর কোনো আকর্ষণবোধ করি না।
'শুধু আশা কোনদিন দীর্ণ বৃদ্ধ হবো।
মৃত্তিকায় পড়ে রবে বয়োত্তীর্ণ রসহীন বীজ,
উৎসুক হবে না কেউ ধ্বংসপ্রাপ্ত দেবতার সাবে।"[২০]

বার্ধক্য, নিঃসঙ্গতা, মৃত্যুচেতনার সমন্বয়ে বিনির্মিত এই 'শূন্যতা'। জীবন-যন্ত্রনার আর এক নাম 'শূন্য'; যে 'শূন্য' থেকেই জন্ম-জন্মান্তরের অবিরত ইশারা হাতছানি দেয়। আর আঙ্কিক উদ্বেজনায় কবি উচ্চারণ করেন, -

"সমীকরণের মতো উপস্থিত শর্তাবলী
পৃথকতা থেকে এসে একীভূত হবার নিয়মে
কিছু পরিবর্তীদের বহিষ্কারে শেষে নিয়ে আসে
সম্ভব স্বাধীনতার রূপতল, আকার, প্রকৃতি—"[২১]

তবে গণিতবিদ্ কবি শেষাবধি বৈষয়িক সংখ্যাতত্ত্ব বা গাণিতিক ধারণাকেই জগৎ ও জীবনের শেষ সত্য বলে মনে করেননি। একটি কবিতায় তাঁর সেই অনুভব ব্যক্ত করেছেন আত্যন্তিক স্পষ্টতায়, -

"অনেক কিছুই আছে যা গণিত দিয়ে

সমাধান করা অতীব কঠিন এক কাজ।
যেমন পরমেশ নামক প্রাণীটি।
পরমেশের উপরে কোনো দেবতা আছে কি, এই
কথা গণিত দিয়ে সমাধান করা এক দুরূহ ব্যাপার।
নানান জটিলতা দেখা দেয়
গণিত দিয়ে এই ব্যাপার সমাধান করার বেলায়।
এমতাবস্থায় ব্যাকরণ দিয়ে সমাধান করতে হয়।
ব্যাকরণ ব্যাকরণ পুনরায় ব্যাকরণ।"[২২]

অতঃপর কবি পৌঁছে গেলেন যেন জন্মান্তরে। লিখলেন, *এখন দ্বিতীয় শৈশবে* (১৯৯৯); সাধারণত মানুষের জীবনে শৈশব একবার আসে; কিন্তু জীবন নিয়ে খেলা-করা কবির এক-জীবনে একাধিকবার শৈশব আসতে বাধা থাকে না; মানসিক দিক থেকে কবি বিনয় মজুমদার যথার্থই দ্বিতীয় শৈশবে পৌঁছে ছিলেন। যৌবনের কলকাতা ত্যাগ করে এসে শৈশবের শিমুলপুরের বিনোদিনী কুঠিতে তাঁর যে যাপন তা তো শৈশব-যাপনেরই নামান্তর। 'একসঙ্গে তিনটি কবিতা'তে কবি যা লিখছেন তাতে শৈশব-বৃত্তির মৌল প্রকাশ দেখা যায়,[২৩]

একটি পংক্তি

"কতদিন ট্রামে চড়িনি!"

'ভাত'

"রেখা আমাকে ভাত রান্না ক'রে দেয়।"

'আমার বাড়ি'

"দৈব আমার বাড়িতে থাকে।"

আবার 'পৃথিবী নামক' কবিতায় কবি অনায়াসে লিখতে পারেন, -

"পৃথিবী নামক গ্রহের নাম
পালটে ফেলা হয়েছে।
সকলেরই কৌতুহল থাকা স্বাভাবিক
পৃথিবীর বদলে এই গ্রহের
নতুন নামটি কী?
সবার অবগতির জন্য জানাই
নতুন নামটি 'রবীন্দ্র গ্রহ'।
পৃথিবীব সব ভূগোলের বইতে
ছাপুন 'আমরা রবীন্দ্র গ্রহে বাস করি।"[২৪]

সাধারণ মানুষ যখন স্মৃতি আর স্বপ্নে ছাড়া শৈশবকে আর ছুঁতে পারেন না, তখন কবি বিনয় মজুমদার স্বভাবে-বিশ্বাসে, সরলতা-ব্যবহারে, জীবনে-যাপনে এ-ভাবেই শৈশবের বোধে উপনীত হয়েছিলেন। কবিতার স্বয়ং এক বোধিবৃক্ষ যখন লেখেন '*কবিতা বুঝিনি আমি*' তখন বিরল বিরোধাভাস ঘটে। কিন্তু তাঁর পাঠক বিভ্রান্ত হন না, আমরাও বিভ্রান্ত হই না; বরং মনে করি, নিশ্চিত কবির এ-কোনো আত্মঘোষণা নয়; এক অমল অভিমানে *কবিতা বুঝিনি আমি* কবি এমন উচ্চারণ

করছেন। আমি সব জানি, আমি সব বুঝি— এ স্পর্ধার গৌরবে বিনয় মজুমদার কোনোদিন গৌরবান্বিত হতে চাননি। যিনি গণিতের সৌন্দর্যে সমর্পিত তিনি নান্দনিক তৃপ্তি পান, গণিতের নির্দিষ্ট রূপকে সুন্দর করে আনন্দ উপভোগ করেন, দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা মাঝেও তিনি হর্ষের মনন-জগতে বসবাস করেন। যাঁরা বিনয় মজুমদারের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তাঁরা জানেন যে উত্তর দেবার সময়ে তিনি হঠাৎই রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে উঠতেন এবং শিমুলপুরে থাকাকালীন কয়েকটি গানও রচনা করেছিলেন।

ওমর খৈয়ামও এমিলি ডিকিনসনও গণিতের সৌন্দর্যের বনেদে গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের কাব্য। গণিতের সঙ্গে কবিতা ও সংগীতের, এমনকী পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের আরাধ্য পুস্তকগুলোর গাণিতিক লেখনবিন্যাসে (যেমন বেদ, গীতা, ত্রিপিটক, জেন্দাবেস্তা, বাইবেল, কোরান, গুরুগ্রন্থ, তোরা, তালমুদ, কিতাব-ই-আকদাস, অগমসমূহ, কোইজিকি ইত্যাদি) পার্থক্য খুঁজে পান না গণিত ও কবিতার বিস্ময়ে আক্রান্ত বেশ কয়েকজন গণিতবিদ। কবিতা ও সংগীতের মতো তাঁদের মননে গণিত অনির্বচনীয়, তা ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি ক্রিয়ায় বিদ্যমান। গাণিতিক সৌন্দর্যের বিখ্যাত উদাহরণটি হল পিথাগোরাসের উপপাদ্যটি।

বিনয় মজুমদারের সঙ্গে জীবনানন্দের প্রধান তফাৎ এখানেই। বিনয় দারিদ্র, দুঃখ, কষ্ট, অবহেলা, অসুস্থতা, নিঃসঙ্গতা সত্ত্বেও থাকতেন আনন্দের প্রভায় জ্যোতির্ময়। কবিতাকে জীবনের সঙ্গে একাত্ম করেছেন বিনয় মজুমদার।

২০০০ সালে প্রকাশিত ডেভলিন কিথ্ (J. Devlin Keith, Born 16 March, 1947) তাঁর *‘ডু ম্যাথেমেটিশিয়ানস হ্যাভ ডিফারেন্ট ব্রেইনস’* গ্রন্থে হাঙ্গেরীয় গণিতবিদ্ পল্ এরডস্-কে উদ্ধৃত করে গণিতের সঙ্গে সংগীতের সম্পর্ক স্পষ্ট করেছেন। তাছাড়া গণিতের সৌন্দর্য নিয়ে কবিতা ইউরোপ আমেরিকায় বহুকাল যাবৎ লেখা হচ্ছে। যেমন মারিয়ান মুর-এর ‘দি আইকোস্যাস ফিয়ার’, কার্লস্যান্ড বার্গের ‘অ্যারিথম্যাটিক’, ওয়ালেস স্টিভেন্সের ‘ল্যান্ডস্কেপ ফাইভ’, ভ্যাচেল লিন্ডসের ‘ইউক্লিড’ ইত্যাদি। বাংলাদেশের কবি আল মাহমুদ যথার্থই বলেছিলেন, ‘বিনয় অগোছালো একজন কবি আর আমি খুব গোছানো কবি’, তিনি আশ্রয় নিয়েছেন ধর্মে, যখন কিনা বিনয় মজুমদার ধর্মকে ছোঁয়াচে রোগের মতো পরিহার করে গণিতের আশ্রয় নিয়েছেন, এবং গণিত যাঁরা ভালোবাসেন তাঁদের মতন বিনয় মজুমদার একজন বেপরোয়া কবি। বিনয়ের এই গাণিতিক কবিতার মতো আল মাহমুদ কোনোদিন রহস্যময় কবিতা লেখেননি, লেখা সম্ভবও ছিল না তাঁর শেষ পর্যায়ের মৌলবাদী জীবন পরিসরে।

বিনয় মজুমদার লিখিত একটি গান (গণিতাশ্রিত গান) :[২৫]

$x = 0$
এবং $y = 0$
বা $x = 0 = y$
বা $x = y$
শূন্য 0 থেকে প্রাণী x ও y সৃষ্টি হল
এই ভাবে বিশ্ব সৃষ্টি শুরু হয়েছিল।

বিনয় মজুমদারের ‘কবি’ হয়ে ওঠার আত্ম-বৃত্তান্ত চমৎকার ধরা পড়েছে তাঁর ডায়েরির অংশে —

> “আমি গত তিরিশ বছর ধরে একটা বিষয় ভেবেছি। ভেবে ভেবে শেষে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। পৃথিবীতে কত মানুষ সৎ আর কত মানুষ অসৎ — এই ছিল আমার চিন্তার বিষয়।” [ঈশ্বরী ও আমি ও সময় পৃ. ১৭]

সরল শিশুর মতন ভানহীন, ‘বিনয় প্রকৃতপক্ষে বিধাতার এক অপূর্ব অট্টহাসি; সুস্থতা আর অসুস্থতার ক্রমবিপরীত ডিজাইনে বোনা তাঁর জীবন। মাঝখানের যেটুকু অসামান্যতা তাও বিপুল ছোঁয়।’ তাঁর কাব্যতত্ত্ব যেন গাণিতিক তত্ত্ববিশ্বের প্রচ্ছায়া মাত্র। গায়ত্রী — ঈশ্বরী — চাকা আর শূন্যের অভিনব এক গাণিতিক সমীকরণে কবি বিনয় মজুমদারের একত্ব এবং মহত্ব।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 153 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Reference:

১. ত্রিপাঠী, দীপ্তি, আধুনিক বাংলাকাব্য পরিচয় (১৯৯২), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩
২. বসু, বুদ্ধদেব সম্পাদিত, আধুনিক বাংলা কবিতা, (ভূমিকাংশ), পৃ. ১০
৩. দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ, কুলায় ও কালপুরুষ (১৩৬৪ বঙ্গাব্দ), সিগনেট প্রেস, কলকাতা-২০; পৃ. ৬৯
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্যের পথে, 'আধুনিক কাব্য' (১৯৩৬), বিশ্বভারতী, পৃ. ১৩১
৫. দাশ, জীবনানন্দ, কবিতার কথা (১৪১৩ বঙ্গাব্দ) পৃ. ১১০
৬. দাশ, জীবনানন্দ, কবিতার কথা (১৪১৩ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১১২
৭. আইয়ুব, আবু সয়ীদ, সম্পা., আধুনিক বাংলা কবিতা (১৯৯৯), দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, পৃ. ৪০
৮. আইয়ুব, আবু সয়ীদ, সম্পা., আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ (১৯৯৫), দে'জ পাবলশিং, কল-৭৩, পৃ. ১৪
৯. ত্রিপাঠী, দীপ্তি, আধুনিক বাংলাকাব্য পরিচয় (১৯৯২), দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩ পৃ. ২-৩
১০. ত্রিপাঠী, দীপ্তি, আধুনিক বাংলাকাব্য পরিচয় (১৯৯২), দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩ পৃ. ৩-৪
১১. দে, বিষ্ণু, নাম রেখেছি কোমল গান্ধার : কবিতা সমগ্র-২ (১৯৯০), আনন্দ পাবলিশার্স, কল-৯ পৃ. ৯৫
১২. মজুমদার, বিনয়, কবিতার খসড়া/ ৭ : বিনয় মজুমদার কাব্য সমগ্র-২য় খণ্ড (২০১৪), প্রতিভাস, কল-২ পৃ. ৪৬
১৩. ভট্টাচার্য, তপোধীর, আধুনিকতা পর্ব থেকে পর্বান্তর (১৯৯৫), পুস্তক বিপণি, কল - ৯ পৃ. ৬
১৪. রায়চৌধুরী, সমীর, পোস্টমর্ডান কবিতা বিচার (১৯৯৮), কবিতা পাক্ষিক, কল - ২৬, পৃ. ৩২
১৫. রায়চৌধুরী, সমীর, পোস্টমর্ডান কবিতা বিচার (১৯৯৮), কবিতা পাক্ষিক, কল - ২৬, পৃ. ৩২
১৬. নতুন কবিতা : বিনয় মজুমদার কাব্য সমগ্র - ২য় খণ্ড (২০১৪), প্রতিভাস, কল - ২, পৃ. ১৪৪
১৭. পাণ্ডুলিপি থেকে 'গায়ত্রীকে'-১, ঐ - ২য় খণ্ড (২০১৪), প্রতিভাস, কল - ২, পৃ. ১৫১
১৮. তবু গল্পের মতোন মনে হয়/ ঈশ্বরীর, বিনয় মজুমদার কাব্য সমগ্র - ২য় খণ্ড (২০১৪), প্রতিভাস, কল – ২, পৃ. ২০
১৯ আমিই গণিতের শূন্য/ ঐ, বিনয় মজুমদার কাব্য সমগ্র - ২য় খণ্ড (২০১৪), প্রতিভাস, কল - ২, পৃ. ১৭২
২০. আমার কবিতায় আছে/ আমিই গণিতের শূন্য, ঐ - ২য় খণ্ড (২০১৪), প্রতিভাস, কল - ২, পৃ. ১৭২
২১. অধিকন্তু – ৯, বিনয় মজুমদার কাব্য সমগ্র-১ম খণ্ড (২০১৪), প্রতিভাস, কল - ২, পৃ. ৭৬
২২ অনেক কিছুই আছে/ আমিই গণিতের শূন্য, ঐ - ২য় খণ্ড (২০১৪), প্রতিভাস, কল - ২, পৃ. ১৫৯
২৩ এখন দ্বিতীয় শৈশবে, বিনয় মজুমদার কাব্য সমগ্র-২য় খণ্ড (২০১৪), প্রতিভাস, কল - ২, পৃ. ১৮৩
২৪ পৃথিবী নামক/ এখন দ্বিতীয় শৈশবে, ঐ - ২য় খণ্ড (২০১৪), প্রতিভাস, কল - ২, পৃ. ১৮৫
২৫ একটি গান, ঐ - ২য় খণ্ড (২০১৪), প্রতিভাস, কল - ২, পৃ. ১৯৩